# সিঁড়ির দ্বিতীয় ধাপে ডিজিটাল বাংলাদেশ

**মোস্তাফা জব্বার**

২০০৮ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ দিন বদলের সনদ তৈরি করেছিল নির্বাচনী ইশতেহার হিসেবে। সেই ইশতেহারেরই একটি অংশ ছিল তথ্যপ্রযুক্তি। তথ্যপ্রযুক্তি খাতে নানা কাজ করার অঙ্গীকারের চেয়ে বড় চমক ছিল একটি স্লোগানে। স্লোগানটি ছিল আমরা বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৫০ বছরে ২০২১ সালে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ব। সেই স্লোগানের পাঁচ বছর অতিক্রান্ত হচ্ছে। সেটি ছিল ডিজিটাল বাংলাদেশ– সিঁড়ির প্রথম ধাপ। আবার দোরগোড়ায় এলো আরেকটি নির্বাচন। এবার আমরা সিঁড়ির দ্বিতীয় ধাপে। আবারও লিখতে হচ্ছে নির্বাচনী ইশতেহার। এবার সেই একই স্লোগান থাকবে কি না বা ডিজিটাল বাংলাদেশ স্লোগানের বিপরীতে এর স্থলাভিষিক্ত করে নতুন কোনো স্লোগান আসবে কি না বা এই স্লোগানটির পরিণতি কী হবে সেটি আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহার দেখেই বলা যাবে। পাওয়া তথ্যানুসারে সেই ইশতেহারটি এখন লেখা হচ্ছে। তবে এই স্লোগানটি যে ২০০৮ সালের নির্বাচনে এবং তার পরের পাঁচ বছরে আওয়ামী লীগের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিমনস্কতাকে প্রকাশ করেছে এবং নতুন প্রজন্মের সাথে একটি সুদৃঢ় সেতুবন্ধন তৈরি করেছে, সে বিষয়ে সন্দেহ থাকার কোনো অবকাশ নেই।

স্লোগান ঘোষণার পাঁচ বছর পর যদি ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অগ্রগতির কথা বলা হয়, তবে সার্বিকভাবে এর সফলতার কথাই বলতে হবে। ০৯-১৩ সময়কালে সরকারি-বেসরকারি খাতে আমাদের রাষ্ট্র ও সমাজের যে ডিজিটাল রূপান্তর হয়েছে, তা আমাদের মাইলফলক অর্জন। আমাদের রাষ্ট্রকে জন্মের অঙ্গীকারে প্রতিস্থাপন করার ক্ষেত্রেও আমরা অসাধারণ অগ্রগতি সাধন করেছি। অন্যদিকে যদি তথ্যপ্রযুক্তির সামনের পাঁচ বছরের অর্জনের কথা বলতে হয়, তবে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকার বহাল রেখেই নিশ্চিতভাবে সুস্পষ্টভাবে আরও কিছু নতুন কথা বলতে হবে। কোনোভাবেই ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে চাই– এই স্লোগান থেকে সরে আসা যাবে না। আমার ধারণা, আওয়ামী লীগের নীতিনির্ধারক মহল এবং নির্বাচনী ইশতেহারের রচয়িতারা এ বিষয়ে সচেতন রয়েছেন।

ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচি, ধারণা বা স্লোগানের সাথে গোড়ার সম্পৃক্ততার সূত্র ধরে আমি একথা বলতে পারি, এবার ২০২১ সালে ডিজিটাল বাংলাদেশ যে হবেই সেই প্রতিজ্ঞাটি আওয়ামী লীগকে দৃঢ়তার সাথে প্রকাশ করতে হবে এবং সরকার গঠন করলে সামনের পাঁচ বছরের মেয়াদকালে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলার প্রধান কাজটি সম্পন্ন করে ফেলা হবে, সেই কথাটিও বলতে হবে। বস্তুত শুধু আওয়ামী লীগ কেনো, কারও পক্ষেই এখন আর ডিজিটাল বাংলাদেশ ধারণা ও কর্মসূচিকে অস্বীকার করা সহজ হবে না। নির্বাচনী ইশতেহারে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সবাইকেই ডিজিটাল রূপান্তর, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উচ্চতর ব্যবহার ইত্যাদির কথা বলতেই হবে।

ডিজিটাল বাংলাদেশ স্লোগান দেয়ার পর পাঁচ বছরে পৃথিবীটা অনেক বদলে গেছে। এ পরিবর্তনের সবচেয়ে বড় নিয়ামক ছিল তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি। কথাটি বাংলাদেশের জন্যও প্রযোজ্য। পাঁচ বছর আগের বাংলাদেশকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যাপকভাবে বদলে দিয়েছে। এর দৈনন্দিন জীবন থেকে রাষ্ট্রীয় কাজকর্ম পর্যন্ত সব ক্ষেত্রেই পাওয়া গেছে ডিজিটাল প্রযুক্তির ছোঁয়া। কেউ যদি জানতে চান, ডিজিটাল বাংলাদেশের কতটা পথ এগিয়েছি আমরা, তবে তার জবাব হচ্ছে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার জন্য যে ভিতটি রচনা করার দরকার ছিল সেটি আমরা খুব মজবুতভাবে তৈরি করতে পেরেছি। হতে পারে পাঁচ বছরে আমরা আরও অনেকটা পথ এগিয়ে যেতে পারতাম। হয়তো আমাদের প্রত্যাশা আরও বেশি ছিল। সেসব প্রত্যাশা পূরণের কথা বলার আগে ভাবতে হবে, শত শত বছরের প্রাচীন একটি আমলাতন্ত্র বহাল রেখে একটি কৃষিভিত্তিক সমাজ থেকে ডিজিটাল যুগের পথে আমাদের পক্ষে কতটা সামনে যাওয়া সম্ভব ছিল। আর সেজন্যই আমাদের প্রত্যাশার পুরোটা পূরণ না হলেও ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার পথে আমরা পিছিয়ে পড়িনি। বরং ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার স্লোগান দিয়ে আমরা দেশের সব মানুষের কাছে এর অপরিহার্যতা প্রকাশ করতে পেরেছি এবং এ ধারণাটি সাধারণ মানুষের কাছেও ব্যাপকভাবে গৃহীত হয়েছে। এমন একটি স্লোগান দিতে পারাটাই ছিল আমাদের প্রথম সফলতা। সেই স্লোগাটির অপরিহার্যতা জাতির কাছে গ্রহণযোগ্য করাতে পারা তারচেয়েও বড় সফলতা। এবার সেই স্লোগানটিকে আরও সংহত করতে হবে এবং বলতে হবে, ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লড়াইটা সারা পৃথিবীর ডিজিটাল যুগে যাত্রারই অংশ। আমরা দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন কেউ নই এবং দুনিয়ার পরিবর্তনের অংশ হিসেবে আমাদের পরিবর্তনটাকেও সামনে নিয়ে যেতে হবে। দুনিয়ার সমাজটার ডিজিটাল রূপান্তর হচ্ছে। বিশ্বের সব দেশের শিক্ষা, সরকার, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ, মিডিয়া, ব্যবস্থাপনা ও কলকারখানাসহ শিল্প ও কৃষি ডিজিটাল হচ্ছে। বিশ্ববাসী একটি ডিজিটাল সমাজ গড়ে তোলার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এমনকি জাতিসংঘ জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গড়ে তোলার প্রতিজ্ঞায় বিশ্বের সব দেশকে ঐক্যবদ্ধ করেছে। সেই প্রতিজ্ঞায় আমরাও আছি। আমরা আমাদের সমাজটাকেও ডিজিটাল রূপান্তরের পথে নিয়ে যাচ্ছি এবং এই রূপান্তরের চূড়ান্ত ফলাফল যেটি হবে, তার নাম জ্ঞানভিত্তিক সমাজ। এর মানে আমরা ২০২১ সালে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার যে অঙ্গীকার করেছি, সেটি অব্যাহতভাবেই চলতে থাকবে। সামনের পাঁচ বছরে চলমান সময়কালের চেয়েও প্রবল গতিতে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার কাজ চালিয়ে যেতে হবে। এ সময়ে বিশ্বের ডিজিটাল রূপান্তরের গতি আরও প্রবলভাবে বেড়ে যাবে।

যখন আমরা জনগণের কাছে নির্বাচনী ঘোষণা হিসেবে কোনো বিষয় প্রকাশ করি, তখন তথ্যপ্রযুক্তি অংশসহ নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির সব ক্ষেত্রেই তার প্রতিফলন ঘটাই। একটি বিষয় স্পষ্টভাবে বলা দরকার, এরই মাঝে ডিজিটাল বাংলাদেশ যে শুধু একটি রাজনৈতিক স্লোগান নয় বা এটি যে শুধু তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক একটি কর্মসূচিও নয়, সেটি আমরা স্পষ্টভাবে বলেছি।

ঐতিহাসিকভাবে বাংলাদেশ একটি কৃষিপ্রধান দেশ। হাজার হাজার বছর ধরে এখানে কৃষি-সভ্যতা বিকশিত হয়েছে। আমরা ইউরোপের শিল্প বিপ্লবের অংশীদার হতে পারিনি। অতি সম্প্রতি এখানে কিছু শিল্পকারখানা গড়ে উঠলেও শিল্পায়ন যাকে বলে তা তেমনভাবে হয়নি। এখানে সমাজটি শিল্প যুগের উপযোগী হয়নি। শিল্প যুগের নগরায়ন ও সাংস্কৃতিক বিকাশও এখানে ঘটেনি। নগরায়ন, শিল্পায়ন ও অন্যান্য পরিবর্তনের পরও দেশটি যে কৃষি সভ্যতায় আছে তার প্রকাশ ঘটে সর্বত্র। ফলে আমরা প্রকৃতার্থেই কৃষি যুগ থেকে ডিজিটাল যুগে পৌঁছাচ্ছি।

খুব সঙ্গত কারণেই ইউরোপ বা শিল্পোন্নত অন্যান্য দেশে যেভাবে ডিজিটাল রূপান্তরটা হচ্ছে, সেভাবে আমাদের দেশে হবে না। আমাদের পথটা অনেকটাই ভিন্ন হবে। আমরা হয়তো তাদের ভুলগুলোর খতিয়ান নিতে পারি এবং সেই ভুলগুলো যেনো না করি সেটি নিশ্চিত করতে পারি, তবে আমাদের ডিজিটাল রূপান্তর আমাদের মতো করেই করতে হবে।

আমি খুব সংক্ষেপে আমাদের ডিজিটাল রূপান্তরের অগ্রাধিকার খাত এবং কৌশলগুলো বর্ণনা করতে চাই। আমাদের সবকিছুর ডিজিটাল রূপান্তরের যে লক্ষ্য সেটির জন্য আমি প্রধানত চারটি কৌশলকে চিহ্নিত করতে চাই, যার মাধ্যে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার থাকবে মানবসম্পদ বিষয়ে।

**ডিজিটাল রূপান্তর ও মানবসম্পদ :** বাংলাদেশের মতো একটি অতি জনবহুল দেশের জন্য ডিজিটাল রূপান্তর ও জ্ঞানভিত্তিক রূপান্তরের প্রধানতম কৌশল হতে হবে এর মানবসম্পদকে সবার আগে রূপান্তর করা। এ দেশের মানবসম্পদের চরিত্র হচ্ছে, জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকই তিরিশের নিচের বয়সী। এ জনসংখ্যারও বিরাট অংশ এখন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নিয়ে দক্ষতা অর্জনে নিয়োজিত। অন্যরা প্রাতিষ্ঠানিক-অপ্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ নিতে সক্ষম। এদেরকে দক্ষ জ্ঞানকর্মী বানাতে হলে প্রথমে প্রচলিত শিক্ষার ধারাকে বদলাতে হবে। এজন্য আমরা আমাদের ▸

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে কৃষি শ্রমিক বা শিল্প শ্রমিক গড়ে তোলার লক্ষ্যটিকে জ্ঞানকর্মী তৈরি করার লক্ষ্যে পরিবর্তন করতে পারি। আমাদের নিজের দেশে বা বাইরের দুনিয়াতে কায়িক শ্রমিক, কৃষি শ্রমিক ও শিল্প শ্রমিক হিসেবে যাদেরকে কাজে লাগানো যাবে তার বাইরের পুরো জনগোষ্ঠীকে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারে সক্ষম জ্ঞানকর্মীতে রূপান্তর করতে হবে। বস্তুত প্রচলিত ধারার শ্রমশক্তি গড়ে তোলার বাড়তি কোনো প্রয়োজনীয়তা হয়তো আমাদের থাকবে না। কারণ তিরিশোর্ধ যে জনগোষ্ঠী রয়েছে, বা যারা ইতোমধ্যেই প্রচলিত ধারার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা পেয়েছে তাদের প্রচলিত কাজ করার দক্ষতা রয়েছে এবং তারাই এ খাতের চাহিদা মিটিয়ে ফেলতে পারবে। ফলে নতুন প্রজন্মকে ডিজিটাল শিক্ষাব্যবস্থার সহায়তায় জ্ঞানকর্মী বানানোর কাজটাই আমাদেরকে করতে হবে। এর হিসাবটি একেবারেই সহজ। বিদ্যমান শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে অবিলম্বে জ্ঞানকর্মী সৃষ্টির কারখানা হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। এটি বস্তুত একটি রূপান্তর। প্রচলিত দালানকোটা, চেয়ার-টেবিল, বেঞ্চ বহাল রেখে এর শিক্ষাদান পদ্ধতি এবং শিক্ষার বিষয়বস্তু পরিবর্তন করতে হবে।

এ কৌশলটিকে অবলম্বন করার জন্য আমাদের বড় চ্যালেঞ্জ হলো পুরো শিক্ষাব্যবস্থাকে বদলানো। বিরাজমান শিক্ষাকে একটি ডিজিটাল শিক্ষাব্যবস্থায় রূপান্তর করার মধ্য দিয়েই শুধু এ লক্ষ্য অর্জন করা যেতে পারে। পাঠক্রম, পাঠদান পদ্ধতি, মূল্যায়ন সব কিছুকে ডিজিটাল করেই এ লক্ষ্য অর্জন করা যেতে পারে। এজন্য জাতিগতভাবে কাজ আমরা শুরু করেছি। একটি বড় উদ্যোগ হলো বাধ্যতামূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি শিক্ষা। আমাদের স্কুলের ষষ্ট-সপ্তম-অষ্টম এবং একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণীতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়টি সবার জন্য বাধ্যতামূলক হয়েছে। সামনের ১৫ সালে নবম-দশম শ্রেণিতেও এটি বাধ্যতামূলক হচ্ছে। পরিকল্পনা আছে একে প্রাথমিক স্তরেও বাধ্যতামূলক করার। আমরা এরই মাঝে সরকারিভাবে ২৩ হাজার ৫০০ ডিজিটাল ক্লাসরুম তৈরি করেছি। ১০ হাজারের বেশি শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দিয়েছি। আমরা শিক্ষার জন্য আলাদাভাবে নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা গড়ে তুলছি। স্থাপন করছি ডিজিটাল বিশ্ববিদ্যালয়। তৈরি করা শুরু করেছি ডিজিটাল কনটেন্ট। আমার নিজের হাতেই রয়েছে নার্সারি, কেজি ও প্রথম শ্রেণীর ডিজিটাল শিক্ষার জন্য সফটওয়্যার। দেশজুড়ে গড়ে তোলা আনন্দ মাল্টিমিডিয়া ও ডিজিটাল স্কুলে সেসব সফটওয়্যার অত্যন্ত সফলতার সাথে প্রয়োগ করা হচ্ছে। এসব কাজ প্রয়োজনের তুলনায় একেবারেই নগণ্য। তবে শুরুটা যেমনই হোক, আমাদের সামনের কাজগুলো আরও স্পষ্ট করতে হবে। আমি পাঁচটি ধারায় এ রূপান্তরে মোদ্দাকথাটা বলতে চাই।

ক. প্রথমত তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়টি শিশু শ্রেণী থেকে বাধ্যতামূলকভাবে পাঠ্য করতে হবে। প্রাথমিক স্তরে ৫০ নম্বর হলেও মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে বিষয়টির মান হতে হবে ১০০। স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসা, ইংরেজি-বাংলা-আরবি নির্বিশেষে সবার জন্য এটি অবশ্য পাঠ্য হবে।

খ. দ্বিতীয়ত প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রতি ২০ জন ছাত্রের জন্য একটি করে কমপিউটার হিসেবে কমপিউটার ল্যাব গড়ে তুলতে হবে। এ কমপিউটারগুলো শিক্ষার্থীদেরকে হাতেকলমে ডিজিটাল যন্ত্র ব্যবহার করতে শেখাবে। একই সাথে শিক্ষার্থীরা যাতে সহজে এমন যন্ত্রের স্বত্বাধিকারী হতে পারে রাষ্ট্রকে সেই ব্যবস্থা করতে হবে। পাশাপাশি শিক্ষায় ইন্টারনেট ব্যবহারকে শিক্ষার্থী-শিক্ষক-শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের আয়ত্তের মাঝে আনতে হবে। প্রয়োজনে শিক্ষার্থী ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে বিনামূল্যে ইন্টারনেট ব্যবহার করতে দিতে হবে।

গ. তৃতীয়ত প্রতিটি ক্লাসরুমকে ডিজিটাল ক্লাসরুম বানাতে হবে। প্রচলিত চক, ডাস্টার, খাতা-কলম-বইকে কমপিউটার, ট্যাবলেট পিসি, স্মার্টফোন, বড় পর্দার মনিটর/টিভি বা প্রজেক্টর দিয়ে স্থলাভিষিক্ত করতে হবে।

ঘ. চতুর্থত সব পাঠ্য বিষয়কে ডিজিটাল যুগের জ্ঞানকর্মী হিসেবে গড়ে তোলার জন্য উপযোগী পাঠক্রম ও বিষয় নির্ধারণ করে সেব কনটেন্টকে ডিজিটাল কনটেন্টে পরিণত করতে হবে। পরীক্ষা পদ্ধতি বা মূল্যায়নকেও ডিজিটাল করতে হবে। অবশ্যই বিদ্যমান পাঠক্রম হুবহু অনুসরণ করা যাবে না এবং ডিজিটাল ক্লাসরুমে কাগজের বই দিয়ে শিক্ষাদান করা যাবে না। কনটেন্ট যদি ডিজিটাল না হয় তবে ডিজিটাল ক্লাসরুম অচল হয়ে যাবে। এসব কনটেন্টকে মাল্টিমিডিয়া ও ইন্টারঅ্যাকটিভ হতে হবে।

ঙ. পঞ্চমত সব শিক্ষককে ডিজিটাল পদ্ধতিতে পাঠদানের প্রশিক্ষণ দিতে হবে। সব আয়োজন বিফলে যাবে যদি শিক্ষকরা ডিজিটাল কনটেন্ট, ডিজিটাল ক্লাসরুম ব্যবহার করতে না পারেন বা ডিজিটাল পদ্ধতিতে মূল্যায়ন করতে না জানেন। তারা নিজেরা যাতে কনটেন্ট তৈরি করতে পারেন তারও প্রশিক্ষণ তাদেরকে দিতে হবে।

এ পাঁচটি ধারার বিস্তারিত কাজগুলোতে আরও এমন কিছু থাকবে, যা আমরা এখানে উল্লেখই করিনি। সেসব কাজসহ ডিজিটাল শিক্ষাব্যবস্থার সব কাজ ২০১৪-১৮ সময়কালে সম্পন্ন করতে হবে।

**ডিজিটাল সরকার :** রাষ্ট্র ও সমাজের ডিজিটাল রূপান্তরের আরেকটি বড় বিষয় হলো রাষ্ট্র পরিচালনাকারী সরকারের ডিজিটাল রূপান্তর। বিগত পাঁচ বছরে সরকারের গায়ে ডিজিটাল আঁচড় পড়েছে। সরকার তার নিজের কার্যক্রম ও জনগণকে সেবাদানের ক্ষেত্রে ডিজিটাল পদ্ধতি ব্যবহার করা শুরু করেছে। সরকারের জেলা-উপজেলা পর্যায়ে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের একটি ভালো সূচনাও হয়েছে। সরকার তার নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোকে যুক্ত করার জন্য একাধিক নেটওয়ার্ক প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এর সাথে সরকারি-বেসরকারিভাবে থ্রিজি চালু হয়েছে। খুব দ্রুত এর সম্প্রসারণও হচ্ছে। কিন্তু সরকারের কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা বা সচিবালয়ে সেই ঢেউ বলতে গেলে লাগেইনি। সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেশিরভাগই এখনও ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারে অক্ষম। প্রচলিত ফাইল পদ্ধতি ও কাগজের নোট শিটে লিখে সিদ্ধান্ত নেয়ার প্রক্রিয়াই এখনও প্রবলভাবে চলমান। সরকারের ভূমি ব্যবস্থাপনার চিত্রটি হতাশাব্যঞ্জক। সরকারের সচিবালয়ে গেলে মনে হয় না যে এটি ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার সচিবালয়। অন্যদিকে আদালতের অবস্থাও নাজুক। ওখানে বিচারক থেকে শুরু করে আইনজীবী পর্যন্ত আদালতসংশ্লিষ্ট মানুষেরা সনাতনী ধারার বাইরে পা রাখতে পারেননি। ফলে জনগণের ভোগান্তি চরমে। সামনের পাঁচ বছরে এর আমূল পরিবর্তন করতে হবে। সামনের পাঁচ বছরে পুরো সরকারকে ডিজিটাল হতে হবে। এজন্য সরকারের প্রতিজ্ঞাটি হতে হবে অত্যন্ত সুদৃঢ়।

ক. প্রথমত সরকারি অফিসে কাগজের ব্যবহার ক্রমান্বয়ে বন্ধ করতে হবে। সরকারের সব অফিস, দফতর, প্রতিষ্ঠান, সংস্থার কাগজকে ডিজিটাল পদ্ধতি দিয়ে স্থলাভিষিক্ত করবে। এজন্য সরকার যেসব সেবা জনগণকে প্রদান করে তার সবই ডিজিটাল পদ্ধতিতে দিতে হবে। এখানেও সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নিতে হবে। সরকারি দফতরের বিদ্যমান ফাইলকে ডিজিটাল ডকুমেন্টে রূপান্তরিত করতে হবে। নতুন ডকুমেন্ট ডিজিটাল পদ্ধতিতে তৈরি করতে হবে এবং ডিজিটাল পদ্ধতিতেই সংরক্ষণ করতে হবে। এসব ডকুমেন্টের ডিজিটাল ব্যবহার এবং সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া ডিজিটাল করতে হবে। সরকারের মন্ত্রীরাসহ এর রাজনৈতিক অংশকেও এজন্য দক্ষ হতে হবে। সংসদকে ডিজিটাল হতে হবে। সংসদ সদস্যদেরকেও হতে হবে ডিজিটাল ব্যবস্থা ব্যবহারে দক্ষ। সরকারের বিচার বিভাগকে কোনোভাবেই প্রচলিত রূপে রাখা যাবে না। মামলা-মোকদ্দমার বিবরণসহ বিচার কার্যক্রম পরিচালনা সম্পূর্ণ ডিজিটাল হতে হবে। বিচারক ও আইনজীবীদেরকে ডিজিটাল ব্যবস্থা ব্যবহারে দক্ষ হতে হবে।

খ. দ্বিতীয়ত সরকারের সব কর্মচারী-কর্মকর্তাকে ডিজিটাল যন্ত্র দক্ষতার সাথে ব্যবহার করতে জানতে হবে। এজন্য তাদেরকে ব্যাপকভাবে প্রশিক্ষণ দিতে হবে। নতুন নিয়োগের সময় একটি বাধ্যতামূলক শর্ত থাকতে হবে– সরকার যেমন ডিজিটাল পদ্ধতিতে কাজ করবে, সরকারে নিয়োগপ্রাপ্তদেরকে সেই পদ্ধতিতে কাজ করতে পারতে হবে। হতে পারে, প্রচলিত শিক্ষা-প্রশিক্ষণ থেকে এই যোগ্যতা কারও পক্ষে অর্জন করা সম্ভব হবে না। এজন্য সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগের শর্ত হিসেবে তথ্যপ্রযুক্তির সাধারণ জ্ঞানকে একটি শর্ত হিসেবে রেখে এদের সবার জন্য নতুন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা সরকারকেই করতে হবে।

গ. তৃতীয়ত সব সরকারি অফিসকে বাধ্যতামূলকভাবে নেটওয়ার্কে যুক্ত থাকতে হবে এবং সব কর্মকাণ্ড অনলাইনে প্রকাশিত হতে হবে। সরকারের কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরও সার্বক্ষণিকভাবে নেটওয়ার্কে যুক্ত থাকতে হবে। সরকার যে প্রকল্পগুলো বাস্তবায়ন করছে তার সাথে ডাটা সেন্টার স্থাপন, ডাটা সেন্টারের ব্যাকআপ তৈরি বা আরও প্রাসঙ্গিক কাজগুলো করতে হবে।

ঘ. চতুর্থত সরকারের সব সেবা জনগণের কাছে পৌঁছানোর জন্য জনগণের দোরগোড়ায় সেবাকেন্দ্র থাকতে হবে। যদিও এরই মাঝে ইউনিয়ন পর্যায়ে তথ্য ও সেবাকেন্দ্র স্থাপিত ▸

হয়েছে, তথাপি সিটি কর্পোরেশন ও তার প্রতি ওয়ার্ডে, পৌরসভা ও তার প্রতি ওয়ার্ডে এবং মার্কেটপ্লেসগুলোতেও তথ্য ও সেবাকেন্দ্র স্থাপন করতে হবে। দেশজুড়ে থাকতে হবে বিনামূল্যের ওয়াই-ফাই জোন।

ঙ. পঞ্চমত জনগণকে সরকারের সাথে যুক্ত হওয়ার প্রযুক্তি ব্যবহারকে সব সুযোগ দিতে হবে। থ্রিজির প্রচলন এ বিষয়টিকে সহায়তা করলেও এর ট্যারিফ এবং সহজলভ্যতার চ্যালেঞ্জটি মোকাবেলা করতে হবে।

**ডিজিটাল জীবনধারা :** ২০১৮ সাল পর্যন্ত সময়কালে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় লক্ষ্য হবে ডিজিটাল জীবনধারা গড়ে তোলা। দেশের সব নাগরিককে ডিজিটাল যন্ত্র-প্রযুক্তি দিয়ে এমনভাবে শক্তিশালী করতে হবে এবং তার চারপাশে এমন একটি পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে, যাতে তার জীবনধারাটি ডিজিটাল হয়ে যায়। শিক্ষার যে পরিবর্তনের কথা আমরা বলেছি, তার সাথে সরকারের যে রূপটির বিবরণ আমি দিলাম, তেমনটি বাস্তবায়িত হওয়ার সাথে সাথে বেসরকারি ব্যবসায়-বাণিজ্য, সেবাকে ডিজিটাল করা হলে দেশের মানুষের জীবনধারা ডিজিটাল হয়ে যাবে। এর মাঝে দেশের ব্যাংক ব্যবস্থা, ব্যবসায়-বাণিজ্য, আর্থিক লেনদেন, বৈদেশিক বাণিজ্য ও নাগরিকদের পরস্পরের যোগাযোগসহ গণমাধ্যম ডিজিটাল হলে ডিজিটাল জীবনধারা গড়ার জন্য সহায়ক পরিবেশটি তৈরি হয়ে যেতে পারে। দেশের সব মানুষকে ডিজিটাল সভ্যতা, তার বিকাশ ও অনিবার্যতা সম্পর্কে সচেতন করতে হবে। ডিজিটাল সভ্যতার জন্য উপযুক্ত ও প্রয়োজনীয় সাংস্কৃতিক মান গড়ে তুলতে হবে। মনে রাখতে হবে একটি কৃষিভিত্তিক সমাজের সাংস্কৃতিক মানকে ডিজিটাল যুগের স্তরে উন্নীত করা একটি কঠিনতম কাজ। এর জন্য শিক্ষা-প্রশিক্ষণের পাশাপাশি সচেতনতা তৈরির বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। দেশের গণমাধ্যম, রাজনীতিক, সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংস্থা এ ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। আমি এ কৌশলের জন্যও পাঁচটি কর্মপরিকল্পনার কথা উল্লেখ করছি।

ক. দেশের ইন্টারনেট ব্যবহারে সক্ষম প্রতিটি নাগরিকের জন্য কমপক্ষে ১ এমবিপিএস ব্যান্ডউইডথ সুলভ হতে হবে। দেশের প্রতিইঞ্চি মাটিতে এই গতি নিরবচ্ছিন্নভাবে যাতে পাওয়া যায় তার ব্যবস্থা করতে হবে।

খ. দেশের সব সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, জেলা-উপজেলা-ইউনিয়ন পরিষদ, সরকারি অফিস-আদালত, শহরের প্রধান প্রধান পাবলিক প্লেস, বড় বড় হাটবাজার ইত্যাদি স্থানে ওয়াই-ফাই ব্যবস্থা চালু করতে হবে।

গ. রেডিও-টিভিসহ বিনোদন ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড সব ব্যবস্থা ইন্টারনেটে-মোবাইলে প্রাপ্য হতে হবে।

ঘ. ব্যবসায়-বাণিজ্য, শিল্প-কল-কারখানা, কৃষি, স্বাস্থ্যসেবা, আইন-আদালত, সালিশ, সরকারি সেবা, হাটবাজার, জলমহাল, ভূমি ব্যবস্থাপনাসহ জীবনের সামগ্রিক কর্মকাণ্ড ডিজিটাল করতে হবে।

ঙ. প্রচলিত পদ্ধতির অফিস-আদালত-শিক্ষাব্যবস্থার পাশাপাশি অনলাইন ব্যবস্থা গতে তুলতে হবে।

এ আলোচনায় সরকারের ডিজিটাল রূপান্তরের সাথে বাধ্যতামূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি শেখার সাথে সাথে শিক্ষার ডিজিটাল রূপান্তরের যে বিষয়গুলোর কথা বলেছি, তার সাথে যদি সরকারের বাইরের অংশ বেসরকারি অফিস ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলো ডিজিটাল হয়ে যায়, তবে বাংলাদেশ তার স্বপ্নের ঠিকানায় পৌঁছবে সহজে।

**জন্মের ঠিকানায় রাষ্ট্র কাঠামো :** তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে ওপরের পরিবর্তনগুলো আনার পাশাপাশি সোনার বাংলা হিসেবে গড়ে তোলার জন্য বাংলাদেশ রাষ্ট্রের রাষ্ট্র কাঠামো, আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়গুলোর প্রতিও লক্ষ রাখতে হবে। আমরা রাষ্ট্র কাঠামোতে দেশটিকে একটি গণতান্ত্রিক, জাতীয়তাবাদী, সমাজতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছি। আমাদের স্বাধীনতার ঘোষণায় সেই অঙ্গীকার ব্যক্ত করা আছে।

সার্বিক বিবেচনায় ডিজিটাল বাংলাদেশ শুধু প্রযুক্তির প্রয়োগ নয়, এটি বস্তুত একটি রাজনৈতিক-সামজিক আন্দোলন। সেই আন্দোলনটি আমাদের মুক্তিযুদ্ধের প্রবাহমান ধারার বর্তমান রূপ। ফলে দেশে যে ধরনের রাজনৈতিক আন্দোলন চলছে, তাতে যে বিভাজন রেখাটি সেটির দুই প্রান্তে যে দুই ধারার মানুষ অবস্থান করছে, তার একটি সমীকরণ করা প্রয়োজন। খুব স্পষ্ট করে এটি বলা দরকার, এ রেখার একদিকে রয়েছে একাত্তরের পরাজিত শক্তি এবং অন্যদিকে রয়েছে একাত্তরের বিজয়ীরা। দুর্ভাগ্যজনকভাবে লড়াইয়ের এ মাত্রাটি জনগণের মাঝে তেমনভাবে স্পষ্ট করা সম্ভব হয়নি। তবে বস্তুত এবার যদি মুক্তিযুদ্ধকে, রাষ্ট্রের মৌলিক চরিত্রকে যারা সমর্থন করে তারা যদি জয়ী না হয় এবং যদি তারা সরকার পরিচালনা না করতে পারে তবে প্রথম হোঁচটটি আমাদের রাষ্ট্রব্যবস্থাটিই পাবে। ফলে আমরা যখন রাষ্ট্রের ও সমাজের ডিজিটাল রূপান্তরের কথা বলছি তখন আমাদেরকে মনে রাখতে হচ্ছে রাষ্ট্র যদি তার প্রকৃত রূপে বিরাজ না করে, তবে তার ডিজিটাল রূপান্তর কোনো কার্যকর ফল দেবে না। এমনও হতে পারে ডিজিটাল রূপান্তরের সুফল শুধু ধনিক ও রাষ্ট্রবিরোধীদেরকেই সহায়তা করবে। ফলে আমাদের স্পষ্ট প্রস্তাবনা, রাষ্ট্রের ডিজটাল রূপান্তরের সাথে সাথে এর জন্মের অঙ্গীকারকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সামনের পাঁচ বছরে বাংলাদেশ রাষ্ট্রটিকে তার জন্মের ঠিকানায় পৌঁছাতে হবে। এখানেও পাঁচটি প্রধান করণীয় আমি উল্লেখ করতে পারি।

ক. বাংলাদেশের সংবিধান ও রাষ্ট্রব্যবস্থা একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণা ও অঙ্গীকার অনুযায়ী হবে। এর জন্য সংবিধানে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনতে হবে।

খ. রাষ্ট্রকে জনগণের মৌলিক অধিকার রক্ষার পাশাপাশি সব ধরনের বৈষম্য দূর করতে হবে।

গ. রাষ্ট্রকে রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিকের অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান-শিক্ষা-চিকিৎসার ন্যূনতম প্রয়োজনের দায়িত্ব নিতে হবে।

ঘ. দেশে রাষ্ট্রের মূলনীতির বিরুদ্ধে কোনো রাজনৈতিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক বা অন্য কোনো ধরনের কর্মকাণ্ড করা যাবে না।

ঙ. সব যুদ্ধাপরাধের বিচার করতে হবে এবং তার রায় কার্যকর করতে হবে।

**অভিজ্ঞতায় প্রাপ্ত চ্যালেঞ্জ :** বিগত পাঁচ বছরে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে গিয়ে আমরা যে অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছি তার সবচেয়ে বড়টি হচ্ছে আমলাতন্ত্রের দুর্বলতা। বিদ্যমান আমলাতন্ত্র কৃষি যুগের ধারণায় ঔপনিবেশিক মানসিকতায় পরিচালিত হয়। একই সাথে রাষ্ট্রের রাজনৈতিক নেতৃত্বের বেশিরভাগই ডিজিটাল যুগ গড়ে তোলার ধারণা অনুধাবনে অক্ষম। যাদের ওপর নির্ভর করে ডিজিটাল যুগ গড়ে তোলার চেষ্টা করা হচ্ছে তাদের মাঝেও বিষয়টি স্পষ্ট নয়। আমি প্রস্তাব করছি :

ক. আমলাতন্ত্রকে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিষয়ে সম্যক ধারণা দিতে হবে এবং তাদেরকে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার মূল কারিগর হিসেবে অনুপ্রাণিত করতে হবে।

খ. রাজনীতিবিদদেরকে ডিজিটাল বাংলাদেশ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দিতে হবে এবং তাদেরকে রাজনৈতিক নেতৃত্ব দিতে সক্ষম করে গড়ে তুলতে হবে।

গ. জনগণকে, বিশেষত নতুন প্রজন্মকে ডিজিটাল বাংলাদেশের প্রধান সৈনিক হিসেবে গড়ে তুলতে হবে এবং সেভাবেই তাদের উপলব্ধিকে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার উপযুক্ত করতে হবে।

ঘ. ডিজিটাল বাংলাদেশকেন্দ্রিক সচিবালয় গড়ে তুলতে হবে এবং সেখান থেকেই ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলার সব কর্মকাণ্ডকে সমন্বয় করতে হবে।

ঙ. সরকারপ্রধানকেই ডিজিটাল বাংলাদেশ সচিবালয় নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। তবে তিনি একজন সহকারী নিয়োগ দিতে পারেন।

বস্তুত ২০১৮ সালের মধ্যেই আমাদেরকে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে হবে। বিগত পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতায় আমি নিশ্চিতভাবেই এটি বলতে পারব, সেটি আমাদের পক্ষে করাও সম্ভব। যদিও পুরো কাজটির জন্য আমাদের সামনে বিশাল চ্যালেঞ্জ রয়েছে, তথাপি যে জাতি নয় মাসে স্বাধীনতা অর্জন করতে পারে, সেই জাতি সামনের পাঁচ বছরের মধ্যেই ডিজিটাল বাংলাদেশও গড়তে পারবে। তবে ২০১৮ সালের শেষে মূল্যায়ন করতে গিয়ে আমরা হয়তো দেখতে পাব কিছু কিছু কাজের শেষাংশ বাকি রয়েছে। আমাদের ২০২১ সালে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রতিজ্ঞা আছে বলে ২০১৯, ২০২০ এবং ২০২১ হবে আমাদের অবশিষ্ট ছোট কাজগুলো সম্পন্ন করার সময়। ২০২০ সালে যখন এই জাতি তার পিতার শততম জন্মবার্ষিকী পালন করবে তখন একবার হিসাব মেলাবে এবং মূল্যায়ন করবে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার আর কতটা বাকি এবং তারপরের বছর যখন এই জাতি স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন করবে তখন ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার জয়ন্তীও উদযাপন করবে কজ

*ফিডব্যাক : mustafajabbar@gmail.com*